কাজী আবদুল ওদুদ, জীবন ও মানুষ্যত্বসাধনা

শামসুজ্জামান খান

কাজী আবদুল ওদুদ - এর (১৮৯৪ - ১৯৭০) জীবন ও সাহিত্য সাধনায় এমন এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোনো বাঙালি মুসলমান লেখকের ক্ষেত্রে আমরা পাই না। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সাহিত্য - জীবনে তিনি যে মূল ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করেছিলেন তা হলো, বিশ শতকের প্রথমার্ধের সম্মোহিত মুসলমান সমাজে বুদ্ধির মুক্তি, বিচার - বিবেচনা ও জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা এবং এই লক্ষ্যে তণ তুর্কিদের নিয়ে ঢাকায় মুসলিম - সাহিত্য সমাজ (১৯২৬) ও তার মুখপাত্র হিশেবে শিখা পত্রিকার প্রকাশ। রক্ষণশীল, অন্ধসংস্কারে আচ্ছন্ন ও শাস্ত্রের বোধ - বিবেচনাহীন আনুগত্যে স্থবির মূঢ় সমাজের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ওই দুই স্ফুলিঙ্গে যে দাব ানলের সৃষ্টি হলো তাতে সাহিত্য - সমাজের মূল কর্ণধার হিশেবে আবুল হুসেন, আবদুল ওদুদ শুধু আধিপত্যবাদী সমাজপতিদের দ্বারা নিগৃহীতই হলেন না -- কাজী আবদুল ওদুদকে তৎকালীন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (বর্তমান ঢাকা কলেজ) অধ্যাপনা ছেড়ে কলকাতায় আশ্রয় নিতে হলো। বৈরী পরিবেশে ঢাকা থেকে তিনি চলে যেতে বাধ্য হলেও জীবন, আদর্শগত বিশ্বাস ও মানসমুক্তির অন্বেষা থেকে তাকে কেউ কোনোদিন ধৈর্যচ্যুত করতে পারেনি। মুসলিম সাহিত্য - সমাজের শিখ াটিকে তাই তার মনন - সাধনায় আজীবন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে দেখি। শিখা পত্রিকার বার্ষিক বিবরণীতে এই সাহিত্য - সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল ঃ

'জাতির নবজীবন শু হয় রাজ্যের চিন্তাশীল নাগরিকদের মধ্যে -- তাদের গুটিকয়েক ব্যক্তির চিন্তাস্রোতই ক্রমে সমাজের নিম্নস্তরে ও চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়ে চলে এবং কালক্রমে উহা সমস্ত সমাজকে পুনর্জীবিত করে তোলে। আজ আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণকে সম্মিলিত করে তাদের চিন্তাধারা প্রকাশ করতে হবে বিপুল জনসংঘের ভাষায়। তবেই সমাজের কর্ণে তা পৌঁছবে। সেই ভাষাই হচ্ছে সেই চিন্তাস্রোতের নদীগর্ভ। এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য চিন্তা - চর্চা ও জ্ঞানের জন্য আক াঙক্ষা ও চি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নবীন পুরাতন সর্বপ্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙক্ষা ও চি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নবীন পুরাতন সর্বপ্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগ সাধন।' (শিখা, প্রথম বর্ষ, চৈত্র ১৩৩৩, পৃ. ২১-২২)

ছোট আকারে সৃষ্টি হলেও এই সাহিত্য সমাজ ও তার মুখপত্র শিখা পত্রিকার ভূমিকা সামান্য ছিল না। কাজী আবদুল ওদুদ এ সম্পর্কে বলেছেন, '...সেদিন বিস্ময়কর হয়েছিল বাংলায় শিক্ষিত তণের উপরে এর প্রভাব --- একটি জিজ্ঞাসু ও সহৃদয় - গোষ্ঠীর সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল এর দ্বারা। দৃশ্যত এর প্রেরণা এসেছিল মুস্তফা কালামের উদ্যম থেকে কিন্তু, তারও চাইতে গূঢ়তর যোগ এর ছিল বাংলায় বা ভারতের একালের জাগরণের সঙ্গে তার সেই সূত্রে মানুষের প্রায় সর্বকালের উদার জাগরণ প্রয়াসের সঙ্গে।' (নিবেদন,শত বঙ্গ, কলকাতা ১৩৫৮)

শিখা পত্রিকার বার্ষিক বিবরণীতে আবুল হুসেনের উপর্যুক্ত অংশ এবং কাজী আবদুল ওদুদেরশত বঙ্গ'র নিবেদন অংশে চুম্বকাকারে মুসলিম সাহিত্য - সমাজ ও শিখা পত্রিকার মাধ্যমে শিখাগোষ্ঠির লেখক মনীষী আবুল হুসেন, আনোয়ারুল কাদির, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কা দির প্রমুখের মূল চিন্তাধারা ও মৌলিক বিশ্বাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। এদের মধ্যে যে কাজী আবদুল ওদুদ লেখক ও চিন্তাবিদ হিশেবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন সে স ম্পর্কে আমাদের কোনো সংশয় নেই। ওদুদ সাহেবের সাহিত্য প্রতিভা, তাঁর চিন্তাশক্তির উদ্ভাবনীময় সরসতা এবং তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের গভীরতার নিপুনতা যে - কে ানো অভিনিবেশশীল পাঠককে মুগ্ধ করে। কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্যবিশ্ব ও আগ্রহের ভূগোলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে ওপরে উদ্ধৃততারশত বঙ্গ গ্রন্থের নিবেদনে। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাংলা জাগরণের দ্বিতীয় পর্বের উদ্বোধন যে তারা ঘটাতে চেয়েছিলেন এ সম্পর্কে আমরা কোনো সংশয় পে ষণ করি না। ঊনবিংশ শতকের নগরবাসী বাঙালি হিন্দুর জাগরণে কলকাতার ইংয় বেঙ্গল গোষ্ঠীর যে অবদান বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষার্ধে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য - সমাজের মাধ্যমে যেন তার অনেকটা পূর্ণতা সাধন। এ প্রসঙ্গে এ বিষয়টিও স্মর্তব্য যে কলকাতা এবং ঢাকা -- এই দুই শহরেই ভিনভিয়ান ডিরো জিও (১৮০৯-১৮৩১) এবং কাজী আবদুল ওদুদ প্রায় একই কারণে শিক্ষকতার পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ ভারতে অসমবিকাশের কারণে বাংলার জাগরণ ছিল খণ্ডিত এবং এতে বাঙালি মুসলমানদের কোনো অংশ ছিল না। সেদিক দিয়ে মুসলিম সাহিত্য - সম াজের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকে বাংলার জাগরণের পরিপূরক আন্দোলন বলা যায়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী যে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবকে 'বাংলায় জাগরণ' বিষয়ে ছয়টি লিখিত বক্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ করেন তা একদিকে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ , অন্যদিকে তেমনি ড. বাগচীর দূরদৃষ্টির পরিচয়বহ। কাজী আবদুল ওদুদের এইবক্তৃতার গুত্ব এখানে যে এতে তিনি গোটা ভারত ও বঙ্গের ইতিহাস - ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে গোটা ঊনবিংশ শতকের নবচেতন ার ভাবুক - চিন্তাক - দার্শনিকদের চিন্তাধারার প্রেক্ষাপটে যেমন বাংলার নবজাগরণের ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি এর সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণ প্রয়াসকে যুক্ত করে বাংলার নবজাগরন প্রয়াসকে যুক্ত করে বাংলার নবজাগরণের এক সমন্বিত চিত্র উপস্থাপনা করেছেন। এর গুত্ব অনস্বীকার্য। ওই ভাষণে মুসলিম সাহিত্য - সমাজ এবং তাদের মধ্যে বুদ্ধির মুক্তি-- Emancipation of the Intellect- এর উৎস সম্পর্কে ওদুদ সাহেব লিখেছেন, 'এই মন্ত্র তাঁরা পেয়েছিলেন বহু জায়গা থেকে - কামাল আতাতুর্কের কাছ থেকে, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ও জাঁ ক্রিস্তফের লেখক রোমাঁ রলাঁর কাছ থেকে, পারসিক কবি সাদীর কাছ থেকে আর হজরত মোহাম্মদের কাছ থেকে । এঁদের অন্যতম পরিচালক পরলোকগত অধ্যাপক আবুল হুসেন এক সময়ে বলেছিলেন, হজরত মোহাম্মদের একটি বিখ্যাত বাণী হচ্ছে তাখাল্লুকু বি আখলাবিল্লাহ - আল্লার গুণাবলীতে ভূমিত হও আল্লার গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়ার অথা অনন্ত সদগুণে ভূষিত হওয়া, কাজেই মানুষের উন্নতির অন্ত নেই'..... (বাংলার জাগরণ, পৃ। ১৯৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা ১৩৬৩)।

।। দুই ।।

কাজী আবদুল ওদুদের জীবনের ঢাকা - পর্ব সংক্ষিপ্ত হলেও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। মনে হয়, ঢাকা - পর্ব তাঁর জীবনে দুটি মোটা দাগ কেটে দিয়েছিল, এক, তাঁর চিন্তার ধরন ও প্রকৃতি যথাযথ এবং দুই. তাঁর নৈতিক ও আদর্শিক ভিত্তি সততা ও স্বাধীন চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ঢাকায় ধাক্কা খেয়ে লক্ষ্য আদর্শ ও তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে তিনি আরো বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। আসলে বিশ্বাসদীপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত কাজ করতে গিয়ে তাঁর মানসদিগন্তকে আরো প্রসারিত করে নিয়েছেন। রামমোহন - রবীন্দ্রনাথ - গান্ধী - ইকবাল - সাদী - কামাল আতাতুর্ক অনুধ্যান এবং বাংলার জাগরণ - চর্চাকে তিনি বিশ্লেক্ষাপটে বিন্যস্ত করেছেন কবিগু গ্যেটে সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ও অনুপুঙ্খ তথ্যসমৃদ্ধ দুই খণ্ডের বইয়ে। তবে এত কিছু করেও একটা মূল দ্বন্দ্বের মীমাংসায় পৌঁছানো কঠিন। সে সমস্যা হলো ধর্ম মতে একজন মুসলমান লেখক চিন্তার স্বাধীনতার জন্য তাঁর ধর্ম - বিশ্বাসের সমন্বয় কীভাবে করবেন? কাজী আবদুল ওদুদ দীর্ঘ জীবন সাধনায় এই পথেরই সন্ধান দিতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর পথ সাধারণ বিশ্বাসী মুসলমানের প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণে নয়। তিনি কুরআন, হাদিস এবং মহানবীর (সা.) বাণী, ভাষ্য ও জীবন থেকেই মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তির সূত্র খুঁজেছেন। পরমনিষ্ঠায় বারংবার কুরআন পাঠ ও তাকে অন্তর ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে বুঝেছেন, শেষ জীবনে কুরআনের বিশ্বস্ত এবং মূলের মতো কাব্যময় ভাষায় অনুবাদ করেছেন, এবং তাঁর এই কাজকে একটি পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম শীর্ষক একটি গবেষণালব্ধ ও আবেগবিহীন কিন্তু বিচার - বিবেচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করে (১৯৬৬) তাঁর প্রথম জীবনের লালিত ইচ্ছাকে পূর্ণতা দিয়েছেন। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য জীবনব্যাপী এই সাধনা একালে তুলনারহিত।

।। তিন ।।

এবার আমরা কুরআন হাদিস ও শেষ নবীর জীবন - সাধনা থেকে কাজী আবদুল ওদুদ বুদ্ধি মুক্তি তথা মনুষ্যত্ব সাধনার যে হদিস পেয়েছেন তার কিছু উদাহরণ পেশ করবো। তিনি লিখেছেন 'হে আমার তণ বন্ধু - দল, ভুলোনা কখনো যে বিদ্যা - বুদ্ধি - ধন সম্পদ সবের চাইতে বেশি মূল্য চরিত্রের, আর চরিত্রের ভিত্তি ন্যায় বিচার - ইনসাফ। ... ইনসাফই ইসলাম। ....মুসলমানীর অর্থ সুবিকশিত মনুষ্যত্ব। যে কর্মঠ, বিবেচক, জ্ঞানপিপাসু, দশের সঙ্গে যুক্ত সেই মুসলমান — আর কেউ নয় ... সুখ চেয়োনা কখনো, দারিদ্রও নয় - চাও আত্মবিকাশ' (মহৎ সংবাদ)। 'ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন, 'কোরআন আল্লার বাণী অতএব মানুষকে মানতে হবে, এই - ই কোরআনের প্রধান বক্তব্য নয় বরং কোরআনের প্রধান বক্তব্য এই যে, কোরআন আল্লার বাণী, মানুষ তার বুদ্ধিকে সক্রিয় করে প্রকৃতির দিকে আর ইতিহাসের ঘটনাবলীর দিকে তাকিয়ে কোরআনের নির্দেশের সত্যতা উপলব্ধি কক, আর সেই নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করে ইহকালে ও পরকালে লাভবান হোক' (শাশ্বত বঙ্গ, পৃ ৩২)। অন্যত্র তিনি বলেছেন 'কোরআনে যে বলা হয়েছে, নামাজ পড়, নামাজ কদর্যতা ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে। তা মহামূলবান এক সত্য, কিন্তু মৌলবী মওলানারা কোরআনের ওই আমোঘ সত্য কথাটি উচ্চারণ করলেও বাস্তবে যে সমাজে অকল্যাণ ও কদর্যতা বাড়ছে তার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেন না।' আলেম সমাজের বুদ্ধির এই সক্রিয়তার অভাবকে তিনি চিন্তার দৈন্য হিশেবে দেখেছেন।

জ্ঞানীর জন্য মনের এই সক্রিয়তা কোরআনেরই নির্দেশ। কোরআন থেকে যে অংশ তিনি উদ্ধৃত করেন তা হলো 'তিনি জ্ঞান দেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর যে জ্ঞান পায় সে মহাসম্পদ পায়, জ্ঞানী ভিন্ন আর কেউ বিচার করে দেখে না (২ ২৬৯)।' ওদুদ সাহেব বলেন, 'ধর্মের এই যে মূল কথা মনুষ্যত্ব - সাধন - ব্যাপক ও গভীর মনুষ্যত্ব - সাধন এই ব্যাপারটি না বুঝে ধর্মের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ করতে গেলে যে নিতান্ত কাঁচা বনিয়াদের উপরে ইমারত তোলার চেষ্টা করা হয়, মুসলমান সমাজের শরীয়তপন্থীদের সে বিষয়ে হুঁশিয়ার হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'কোরআনের একটি বাণীর মর্ম এই আল্লা যদি চাইতেন তবে সবাইকে এক জাতীয় লোক করতেন, কিন্তু তিনি মানুষের (বিচার - বুদ্ধির) পরীক্ষা করতে চান, তাই কল্যাণের পথে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কক (৫ ৪৮)।' তিনি বলেন, 'শরীয়তে পুনপ্রবর্তন অবশ্য অসম্ভব, কেননা অতীত অস্তমিত — মৃত, তার যে অংশ সজীব সে তুমি ও আমি; অতীত পুনর্জীবিত হবে না তবে তুমি ও আমি বিপুল সাধনায় নবমহিমা লাভ করতে পারব — সংসারে এক চাঁদের হাট বসাতে পারব।'

ইসলাম - অনুভব ও মনুষ্যত্বের সাধনায় কাজী আবদুল ওদুদ উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদের চিন্তার অনুসারী ছিলেন। স্যার সৈয়দ বলেছিলেন, 'যা সত্য নয় অর্থাৎ সার্থক নয় তা ইসলাম নয়।' তিনি স্যার সৈয়দের এই নীতি প্রয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ঃ কাজী আবদুল ওদুদ

জন্মস্থান ঃ বাঘমারা, পাংশা, ফরিদপুর, ১৮৯৪।

পিতা ঃ কাজী সৈয়দ হোসেন

শিক্ষাজীবন ঃ-

ম্যাট্রিক, ১৯১৩, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। ১৯১৫ ও ১৯১৭ সালে যথাক্রমে আই.এ. ও বি. এ. কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল ইকোনমিতে এম. এ. ১৯১৯ সালে।

কর্মজীবন ঃ-

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ১৯২০ সালে বাংলার অধ্যাপক হিশেবে যোগদান। দীর্ঘ বিশ বছর অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকার পর ১৯৪০ সালে বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের টেক্সট বুক বোর্ডের সেক্রেটারী নির্বাচিত এবং ১৯৫১ ঐ পদে কর্মরত।

মৃত্যু ঃ-

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬) ও শিখা (১৯২৭) পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অগ্রণী পুষ, সুবক্তা কাজী আবদুল ওদুদ পারকিন্সন্স রোগাক্রান্ত হয়ে ১৯৭০ সালের ১৯ মে কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

উল্লেখযোগ্য রচনা ঃ-

মীর পরিবার (গল্পগ্রন্থ) ১৯১৮, নদী বক্ষে (উপন্যাস) ১৯১৮), রবীন্দ্রকাব্য পাঠ (১৯২৭), নবপর্যায় - ২য় খণ্ড (১৯২৯), সমাজ ও সাহিত্য (১৯৩৪), হিন্দু - মুসলমানের বিরোধ (১৯৩৬), আজকার কথা (১৯৪১), কবিগু গ্যেটে (১৯৪৬), শাশ্বত বঙ্গ (১৯৫১), স্বাধীনতা দানের উপহার (১৯৫১), কবিগু রবীন্দ্রনাথ - ১ম

খণ্ড (১৯৫৫), বাংলার জাগরণ (১৯৫৬), হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম (১৯৬৬), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ - ২য় খণ্ড (১৯৬৯)।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com